# সাইবার অপরাধ ও আইনের ব্যবহার

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাইবার অপরাধ। অবশ্য অপরাধ দমনে সরকার সতর্ক। ইতোমধ্যেই এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন করা রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রত্যয়ে প্রযুক্তিগত ব্যবহার ক্রমে বেড়ে যাওয়ায় এর অপব্যবহারের প্রবণতাও বেড়েছে। ইদানীং প্রযুক্তির সুফল বেড়েছে অনেক। কিন্তু কুফলের মাত্রাও কম নয়। আমরা কী পরিমাণ সুফল ও কুফল ভোগ করছি, তা পরিমাপ করতে চাই না। তবে নির্দিষ্ট করা জরুরি যে কুফলের মধ্যে অন্যতম প্রযুক্তিগত অপরাধ।

সম্প্রতি হ্যাকারদের উৎপাতে ইন্টারনেট ব্যবহারে সবারই ভীতি বেড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারনেট আইডিগুলো হ্যাকারদের দৃষ্টিতে থাকছে সর্বক্ষণ এবং প্রায়ই তা হ্যাক হচ্ছে। অ্যাকাউন্ট হ্যাকারদের কবলে পড়লে কখনও সেটি উদ্ধার হয়, আবার কখনও তা আদৌ হয় না। দুঃখের বিষয়, প্রতিনিয়ত সাইবার অপরাধ ও প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা বাড়নো ও আইনের ব্যবহারের উদ্যোগ থাকলেও দেশের কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাছে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো আপডেট পরিসংখ্যান নেই। অনেকেই মনে করেন– প্রযুক্তির আধুনিকায়ন, প্রশিক্ষিত-দক্ষ জনবল ও সচেতনতার অভাবেই সাইবার অপরাধের প্রবণতা বাড়ছে। এ ছাড়া আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বিচার না হওয়া, আইনের সীমাবদ্ধতা, আইন ও অপরাধ সম্পর্কে অজ্ঞতাও সাইবার অপরাধের মূল কারণ বলে মনে হয়। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) একটি সূত্রে জানা যায়, আইসিটি আইন সংশোধন হওয়ার পর ২০১৩ সালে ৩৫টি, ২০১৪ সালে ৬৫টি এবং চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ১০০টির বেশি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে আইসিটি আইনে ৬২টি এবং পর্নোগ্রাফি আইনে ৩১টি মামলা করা হয়। এ পর্যন্ত ৪২টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে 'সাইবার নিরাপদ হেল্প ডেস্ক' চালুর পর ২০১৪ সালের এপ্রিল থেকে এ বছরের মে পর্যন্ত ১০ হাজার ২৬১টি অপরাধের ঘটনায় তাদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এর মধ্যে ফেসবুক অপরাধ ৪০ শতাংশ, অনলাইন ৭ শতাংশ, পর্নোগ্রাফি ৫ শতাংশ, ক্রেডিট কার্ড ৫ শতাংশ, রাজনৈতিক ৪ শতাংশ, মোবাইল ব্যাংকিং ৫ শতাংশ ও ই-মেইল সংক্রান্ত ১০ শতাংশ। এ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে অপরাধের মাত্রা কিছুটা অনুমান করা গেলেও বিভিন্ন কারণে এর প্রকৃত তথ্য নিশ্চিত হয় না। এর কারণ, অনেকেই অপরাধের শিকার হয়েও মান-মর্যাদার ভয়ে তা গোপন রাখছেন।

সম্প্রতি অনলাইন কার্যক্রমের মধ্যে যুক্ত হয়েছে বেচাকেনা। এ ক্ষেত্রেও প্রতিনিয়ত হয়রানি ও বিপদের মুখোমুখি হচ্ছেন গ্রাহকেরা। হয়রানির শিকার হওয়া এই গ্রাহকদের তালিকার একটি বড় অংশই নারী। কোনো সুনির্দিষ্ট আইন কিংবা নীতিমালা না মেনেই অনলাইন বেচাকেনার দোকান খুলে বসেছেন অসংখ্য ব্যবসায়ী, যাদের অনেকের উদ্দেশ্য ইতিবাচক হলেও কিছু অংশের উদ্দেশ্য ইতিবাচক নয়।

বেশিরভাগ পরিসংখ্যান থেকে তথ্য পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সাইবার অপরাধের বেশি শিকার হচ্ছেন নারীরা। আর এ কারণেই সঠিক পরিসংখ্যানটি পাওয়া যাচ্ছে না সাইবার অপরাধের। হয়রানি, মানসম্মান, সামাজিকভাবে হেয় হওয়া ও অজ্ঞতার কারণে থানা-পুলিশ কিংবা সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দিতে চান না তারা। গোয়েন্দা সংস্থা ও আইসিটি বিভাগের তথ্যমতে, সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে ফেসবুক। আর এখানেও সাইবার অপরাধের কারণে সবচেয়ে ভুক্তভোগী নারীরা। বিটিআরসি সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের মাঝামাঝি থেকে চলতি বছরের প্রথম দিক পর্যন্ত বিটিআরসিতে সাইবার অপরাধের ২২০টি অভিযোগ জমা পড়ে। এর মধ্যে ৬০ শতাংশই হচ্ছে ফেসবুক সংক্রান্ত। সম্প্রতি এ সংখ্যার অনুপাত আরও কয়েক গুণ বেড়েছে। অভিযোগগুলোর বেশিরভাগের ধরন হলো ভুয়া আইডি খুলে স্ক্যান্ডাল ছড়ানো, আপত্তিকর দৃশ্য, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের আপত্তিকর ছবি আপলোড করা। এ ছাড়া উগ্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদ বা মৌলবাদ প্রচার। সম্প্রতি সাইবার জগতের মাধ্যমে বড় অপরাধ হিসেবে যোগ হয়েছে মুক্তচিন্তার মানুষ হত্যা। আর এ কারণেও ইন্টারনেট ব্যবহার কিংবা স্বাধীন মতামত দানে সবার মনেই আতঙ্ক কাজ করছে। সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, গত দুই বছরে জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র ও ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর প্রচারণা, প্রতারণা ও পর্নোগ্রাফির অভিযোগে ৪০টি ফেসবুক পেজ ও ব্লগ বন্ধ করে দেয় বিটিআরসি।

বাংলাদেশে বর্তমান আইসিটি আইনের ধারায় সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে নতুন করে সিকিউরিটি অ্যাক্ট প্রণয়নের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কারণ আইসিটি আইনের ৫৭ ধারায় শুধু কারও সম্মানহানি হলে, রাষ্ট্র বা সমাজবিরোধী কোনো তৎপরতা হলে, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রতারণা বা অন্য অপরাধ, যেমন এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে সাইবার হামলা চালাতে পারে, সে ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য বিধান না থাকায় এ বিষয়ে সরকারের উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে।

ক্রমাগত সাইবার সংক্রান্ত অপরাধ বাড়ার কারণে 'তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬' নামে আমাদের দেশে একটি আইন পাস হয়, যা ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়। নিঃসন্দেহে আইনটি সাইবার অপরাধ দমনে ভূমিকা রাখবে– এমনটিই আশা ছিল সব মহলের। কিন্তু আশানুরূপ ফল আসেনি। কারণ, আইনটি প্রণয়নের পরও সাইবার অপরাধ স্বীয় গতিতে যেমন আগের তুলনায় বেড়ে চলছে, তেমনি পরিবর্তিত হচ্ছে সাইবার অপরাধের ধরন ও প্রকৃতি, যা দমনে আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কার্যকরভাবে পেরে উঠছে না।

এ ক্ষেত্রে শুধু কঠোর শাস্তির বিধান করেই কোনো আইন যে কার্যকর করা যাবে, এমনটি আশা করা ঠিক নয়। সাইবার আইন এ দেশে নতুন একটি বিষয়। ফলে এই আইনে বিচার ও তদন্ত করার ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রয়োজন, তা তাদের অনেকেরই নেই। সাইবার বিশেষজ্ঞেরা বলছেন– ইন্টারনেট, কমপিউটার বা মোবাইল ফোন আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেই ব্যবহার কখন অপরাধ হয়ে যেতে পারে, তার ধারণা অনেকের নেই। ইতোমধ্যে উল্লিখিত আইনে দেশে অনেক মামলাও বিচারাধীন অবস্থায় আছে। কিন্তু কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না শেষ পর্যন্ত। প্রচলিত আইনটিতে আলাদা ট্রাইব্যুনালের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা অধিক মামলার ভারে নুয়ে পড়া গতানুগতিক আদালতের মাধ্যমেই বিচার করা হচ্ছে। এতে বিচারকের ওপর অতিরিক্ত মামলার চাপ পড়ে। তথাপি সাইবার সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ে বিচার করতে বিচারকদেরও প্রয়োজন পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। যাতে মামলার ফল পেতে একজন ভুক্তভোগীকে যেন আবার ভুগতে না হয়। এই আইনের প্রয়োগ বছরের পর বছর ধরে চলে আসা ফৌজদারি বা দেওয়ানি বিধির মতো হওয়া উচিত নয়।

ভারতের কলকাতায় সাইবার সংক্রান্ত অপরাধ দমনে লালবাজারে গড়ে তোলা হয়েছে সাইবার থানা। কিন্তু আমাদের দেশে এমন কোনো থানা বা পুলিশের আলাদা কোনো বিভাগ নেই, যারা শুধু সাইবার সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ে কাজ করবে। এমনকি সেখানে বিচারকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই অতি দ্রুত সাইবার সংক্রান্ত অপরাধ মোকাবেলা ও সাইবার অপরাধীদের শনাক্ত করে বিচারের আওতায় আনতে দেশে বিশেষ করে বিভাগীয় শহরগুলোতে পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার আলাদা প্রযুক্তি বিষয়ে কার্যকর ইউনিট গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেই সাথে সাইবার বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বিচারকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত কজ